আতিউর রহমান : রাখাল থেকে অর্থনীতিবিদ

-রাজিব আহমেদ-

দেশবরেণ্য অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরবর্তী গর্ভনর ড. আতিউর রহমানের ছেলেবেলা কেটেছে গরু-ছাগল চরিয়ে! সেখান থেকে আজকের অবস্থানে পৌছাতে তাঁকে অনেক ত্যাগ স্বীকার ও সংগ্রাম করতে হয়েছে। সেই কাহিনী শুনুন তাঁর মুখেই :

আমার জন্ম জামালপুর জেলার এক অজপাড়াগাঁয়ে। ১৪ কিলোমিটার দূরের শহরে যেতে হতো পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে চড়ে। পুরো গ্রামের মধ্যে একমাত্র মেট্রিক পাস ছিলেন আমার চাচা মফিজউদ্দিন। আমার বাবা একজন অতি দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক। আমরা পাঁচ ভাই, তিন বোন। কোনরকমে খেয়ে না খেয়ে দিন কাটতো আমাদের।

আমার দাদার আর্থিক অবস্থা ছিল মোটামুটি। কিন্তু তিনি আমার বাবাকে তাঁর বাড়িতে ঠাঁই দেননি। দাদার বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে একটা ছনের ঘরে আমরা এতগুলো ভাই-বোন আর বাবা-মা থাকতাম। মা তাঁর বাবার বাড়ি থেকে নানার সম্পত্তির সামান্য অংশ পেয়েছিলেন। তাতে তিন বিঘা জমি কেনা হয়। চাষাবাদের জন্য অনুপযুক্ত ওই জমিতে বহু কষ্টে বাবা যা ফলাতেন, তাতে বছরে ৫/৬ মাসের খাবার জুটতো। দারিদ্র্য কী জিনিস, তা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি– খাবার নেই, পরনের কাপড় নেই; কী এক অবস্থা!

আমার মা সামান্য লেখাপড়া জানতেন। তাঁর কাছেই আমার পড়াশোনার হাতেখড়ি। তারপর বাড়ির পাশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হই। কিন্তু আমার পরিবারে এতটাই অভাব যে, আমি যখন তৃতীয় শ্রেণীতে উঠলাম, তখন আর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকলো না। বড় ভাই আরো আগে স্কুল ছেড়ে কাজে ঢুকেছেন। আমাকেও লেখাপড়া ছেড়ে রোজগারের পথে নামতে হলো।

আমাদের একটা গাভী আর কয়েকটা খাসি ছিল। আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওগুলো মাঠে চরাতাম। বিকেল বেলা গাভীর দুধ নিয়ে বাজারে গিয়ে বিক্রি করতাম। এভাবে দুই ভাই মিলে যা আয় করতাম, তাতে কোনরকমে দিন কাটছিল। কিছুদিন চলার পর দুধ বিক্রির আয় থেকে সঞ্চিত আট টাকা দিয়ে আমি পান-বিড়ির দোকান দেই। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দোকানে বসতাম। পড়াশোনা তো বন্ধই, আদৌ করবো– সেই স্বপ্নও ছিল না!

এক বিকেলে বড় ভাই বললেন, আজ স্কুল মাঠে নাটক হবে। স্পষ্ট মনে আছে, তখন আমার গায়ে দেওয়ার মতো কোন জামা নেই। খালি গা আর লুঙ্গি পরে আমি ভাইয়ের সঙ্গে নাটক দেখতে চলেছি। স্কুলে পৌঁছে আমি তো বিস্ময়ে হতবাক! চারদিকে এত আনন্দময় চমৎকার পরিবেশ! আমার মনে হলো, আমিও তো আর সবার মতোই হতে পারতাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাকে আবার স্কুলে ফিরে আসতে হবে।

নাটক দেখে বাড়ি ফেরার পথে বড় ভাইকে বললাম, আমি কি আবার স্কুলে ফিরে আসতে পারি না? আমার বলার ভঙ্গি বা করুণ চাহনি দেখেই হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক কথাটা ভাইয়ের মনে ধরলো। তিনি বললেন, ঠিক আছে কাল হেডস্যারের সঙ্গে আলাপ করবো।

পরদিন দুই ভাই আবার স্কুলে গেলাম। বড় ভাই আমাকে হেডস্যারের রুমের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ভিতরে গেলেন। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট শুনছি, ভাই বলছেন আমাকে যেন বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগটুকু দেওয়া হয়। কিন্তু হেডস্যার অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বললেন, সবাইকে দিয়ে কি লেখাপড়া হয়!

স্যারের কথা শুনে আমার মাথা নিচু হয়ে গেল। যতখানি আশা নিয়ে স্কুলে গিয়েছিলাম, স্যারের এক কথাতেই সব ধুলিস্মাৎ হয়ে গেল। তবু বড় ভাই অনেক পীড়াপীড়ি করে আমার পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি যোগাড় করলেন। পরীক্ষার তখন আর মাত্র তিন মাস বাকি। বাড়ি ফিরে মাকে বললাম, আমাকে তিন মাসের ছুটি দিতে হবে। আমি আর এখানে থাকবো না। কারণ ঘরে খাবার নেই, পরনে কাপড় নেই– আমার কোন বইও নেই, কিন্তু আমাকে পরীক্ষায় পাস করতে হবে।

মা বললেন, কোথায় যাবি? বললাম, আমার এককালের সহপাঠী এবং এখন ক্লাসের ফার্স্টবয় মোজাম্মেলের বাড়িতে যাবো। ওর মায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। যে ক'দিন কথা বলেছি, তাতে করে খুব ভালো মানুষ বলে মনে হয়েছে। আমার বিশ্বাস, আমাকে উনি ফিরিয়ে দিতে পারবেন না।

দুরু দুরু মনে মোজাম্মেলের বাড়ি গেলাম। সবকিছু খুলে বলতেই খালাম্মা সানন্দে রাজি হলেন। আমার খাবার আর আশ্রয় জুটলো; শুরু হলো নতুন জীবন। নতুন করে পড়াশোনা শুরু করলাম। প্রতিক্ষণেই হেডস্যারের সেই অবজ্ঞাসূচক কথা মনে পড়ে যায়, জেদ কাজ করে মনে; আরো ভালো করে পড়াশোনা করি।

যথাসময়ে পরীক্ষা শুরু হলো। আমি এক-একটি পরীক্ষা শেষ করছি আর ক্রমেই যেন উজ্জীবিত হচ্ছি। আমার আত্মবিশ্বাসও বেড়ে যাচ্ছে। ফল প্রকাশের দিন আমি স্কুলে গিয়ে প্রথম সারিতে বসলাম। হেডস্যার ফলাফল নিয়ে এলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, পড়তে গিয়ে তিনি কেমন যেন দ্বিধান্বিত। আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। তারপর ফল ঘোষণা করলেন। আমি প্রথম হয়েছি! খবর শুনে বড় ভাই আনন্দে কেঁদে ফেললেন। শুধু আমি নির্বিকার– যেন এটাই হওয়ার কথা ছিল।

বাড়ি ফেরার পথে সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। আমি আর আমার ভাই গর্বিত ভঙ্গিতে হেঁটে আসছি। আর পিছনে এক দল ছেলেমেয়ে আমাকে নিয়ে

হৈ-চৈ করছে, স্লোগান দিচ্ছে। সারা গাঁয়ে সাড়া পড়ে গেল! আমার নিরক্ষর বাবা, যাঁর কাছে ফার্স্ট আর লাস্ট একই কথা- তিনিও আনন্দে আত্মাহারা; শুধু এইটুকু বুঝলেন যে, ছেলে বিশেষ কিছু একটা করেছে। যখন শুনলেন আমি ওপরের ক্লাসে উঠেছি, নতুন বই লাগবে, পরদিনই ঘরের খাসিটা হাটে নিয়ে গিয়ে ১২ টাকায় বিক্রি করে দিলেন। তারপর আমাকে সঙ্গে নিয়ে জামালপুর গেলেন। সেখানকার *নবনূর লাইব্রেরি* থেকে নতুন বই কিনলাম।

আমার জীবনযাত্রা এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আমি রোজ স্কুলে যাই। অবসরে সংসারের কাজ করি। ইতোমধ্যে স্যারদের সুনজরে পড়ে গেছি। ফয়েজ মৌলভী স্যার আমাকে তাঁর সন্তানের মতো দেখাশুনা করতে লাগলেন। সবার আদর, যত্ন, স্নেহে আমি ফার্স্ট হয়েই পঞ্চম শ্রেণীতে উঠলাম। এতদিনে গ্রামের একমাত্র মেট্রিক পাস মফিজউদ্দিন চাচা আমার খোঁজ নিলেন। তাঁর বাড়িতে আমার আশ্রয় জুটলো।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে আমি দিঘপাইত জুনিয়র হাইস্কুলে ভর্তি হই। চাচা ওই স্কুলের শিক্ষক। অন্য শিক্ষকরাও আমার সংগ্রামের কথা জানতেন। তাই সবার বাড়তি আদর-ভালোবাসা পেতাম।

আমি যখন সপ্তম শ্রেণী পেরিয়ে অষ্টম শ্রেণীতে উঠবো, তখন চাচা একদিন কোত্থেকে যেন একটা বিজ্ঞাপন কেটে নিয়ে এসে আমাকে দেখালেন। ওইটা ছিল ক্যাডেট কলেজে ভর্তির বিজ্ঞাপন। যথাসময়ে ফরম পুরণ করে পাঠালাম। এখানে বলা দরকার, আমার নাম ছিল আতাউর রহমান। কিন্তু ক্যাডেট কলেজের ভর্তি ফরমে স্কুলের হেডস্যার আমার নাম আতিউর রহমান লিখে চাচাকে বলেছিলেন, এই ছেলে একদিন অনেক বড় কিছু হবে। দেশে অনেক আতাউর আছে। ওর নামটা একটু আলাদা হওয়া দরকার; তাই আতিউর করে দিলাম।

আমি রাত জেগে পড়াশোনা করে প্রস্তুতি নিলাম। নির্ধারিত দিনে চাচার সঙ্গে পরীক্ষা দিতে রওনা হলাম। ওই আমার জীবনে প্রথম ময়মনসিংহ যাওয়া। গিয়ে সবকিছু দেখে তো চক্ষু চড়কগাছ! এত এত ছেলের মধ্যে আমিই কেবল পায়জামা আর স্পঞ্জ পরে এসেছি! আমার মনে হলো, না আসাটাই ভালো ছিল। অহেতুক কষ্ট করলাম। যাই হোক পরীক্ষা দিলাম; ভাবলাম হবে না। কিন্তু দুই মাস পর চিঠি পেলাম, আমি নির্বাচিত হয়েছি। এখন চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে যেতে হবে।

সবাই খুব খুশি; কেবল আমিই হতাশ। আমার একটা প্যান্ট নেই, যেটা পরে যাবো। শেষে স্কুলের কেরানি কানাই লাল বিশ্বাসের ফুলপ্যান্টটা ধার করলাম। আর একটা শার্ট যোগাড় হলো। আমি আর চাচা অচেনা ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। চাচা শিখিয়ে দিলেন, মৌখিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে আমি যেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলি: *ম্যা আই কাম ইন স্যার?* ঠিকমতোই বললাম। তবে এত উচ্চস্বরে বললাম যে, উপস্থিত সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

পরীক্ষকদের একজন মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ এম. ডাব্লিউ. পিট আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে সবকিছু আঁচ করে ফেললেন। পরম স্নেহে তিনি আমাকে বসালেন। মুহূর্তের মধ্যে তিনি আমার খুব আপন হয়ে গেলেন। আমার মনে হলো, তিনি থাকলে আমার কোন ভয় নেই। পিট স্যার আমার লিখিত পরীক্ষার খাতায় চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর অন্য পরীক্ষকদের সঙ্গে ইংরেজিতে কী-সব আলাপ করলেন। আমি সবটা না বুঝলেও আঁচ করতে পারলাম যে, আমাকে তাঁদের পছন্দ হয়েছে। তবে তাঁরা কিছুই বললেন না। পরদিন ঢাকা শহর ঘুরে দেখে বাড়ি ফিরে এলাম। যথারীতি পড়াশোনায় মনোনিবেশ করলাম। কারণ আমি ধরেই নিয়েছি, আমার চান্স হবে না।

হঠাৎ তিন মাস পর চিঠি এলো। আমি চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছি। মাসে ১৫০ টাকা বেতন লাগবে। এর মধ্যে ১০০ টাকা বৃত্তি দেওয়া হবে, বাকি ৫০ টাকা আমার পরিবারকে যোগান দিতে হবে। চিঠি পড়ে মন ভেঙে গেল। যেখানে আমার পরিবারের তিনবেলা খাওয়ার নিশ্চয়তা নেই, আমি চাচার বাড়িতে মানুষ হচ্ছি, সেখানে প্রতিমাসে ৫০ টাকা বেতন যোগানোর কথা চিন্তাও করা যায় না!

এই যখন অবস্থা, তখন প্রথমবারের মতো আমার দাদা সরব হলেন। এত বছর পর নাতির (আমার) খোঁজ নিলেন। আমাকে অন্য চাচাদের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, তোমরা থাকতে নাতি আমার এত ভালো সুযোগ পেয়েও পড়তে পারবে না? কিন্তু তাঁদের অবস্থাও খুব বেশি ভালো ছিল না। তাঁরা বললেন, একবার না হয় ৫০ টাকা যোগাড় করে দেবো, কিন্তু প্রতি মাসে তো সম্ভব নয়। দাদাও বিষয়টা বুঝলেন।

আমি আর কোন আশার আলো দেখতে না পেয়ে সেই ফয়েজ মৌলভী স্যারের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, আমি থাকতে কোন চিন্তা করবে না। পরদিন আরো দুইজন সহকর্মী আর আমাকে নিয়ে তিনি হাটে গেলেন। সেখানে গামছা পেতে দোকানে দোকানে ঘুরলেন। সবাইকে বিস্তারিত বলে সাহায্য চাইলেন। সবাই সাধ্য মতো আট আনা, চার আনা, এক টাকা, দুই টাকা দিলেন। সব মিলিয়ে ১৫০ টাকা হলো। আর চাচারা দিলেন ৫০ টাকা। এই সামান্য টাকা সম্বল করে আমি মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হলাম। যাতায়াত খরচ বাদ দিয়ে আমি ১৫০ টাকায় তিন মাসের বেতন পরিশোধ করলাম। শুরু হলো অন্য এক জীবন।

প্রথম দিনেই এম. ডাব্লিউ. পিট স্যার আমাকে দেখতে এলেন। আমি সবকিছু খুলে বললাম। আরো জানালাম যে, যেহেতু আমার আর বেতন দেওয়ার সামর্থ্য নেই, তাই তিন মাস পর ক্যাডেট কলেজ ছেড়ে চলে যেতে হবে। সব শুনে স্যার আমার বিষয়টা বোর্ড মিটিঙে তুললেন এবং পুরো ১৫০ টাকাই বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই থেকে আমাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এস.এস.সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে পঞ্চম স্থান অধিকার করলাম এবং আরো অনেক সাফল্যের মুকুট যোগ হলো।

আমার জীবনটা সাধারণ মানুষের অনুদানে ভরপুর। পরবর্তীকালে আমি আমার এলাকায় স্কুল করেছি, কলেজ করেছি। যখন যাকে যতটা পারি, সাধ্যমতো সাহায্য সহযোগিতাও করি। কিন্তু সেই যে হাট থেকে তোলা ১৫০ টাকা; সেই ঋণ আজও শোধ হয়নি। আমার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করলেও সেই ঋণ শোধ হবে না!